

## কালচারাল হেজেমনি (Cultural Hegemony)

Asif Adnan

June 28, 2022

6 MIN READ

## পর্ব ২

লেখাটি "What Is To Be Done: ইসলামবিদ্বেষ, উগ্র-সেকুলারিসম এবং বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়ের ভবিষ্যৎ" সিরিষের অংশ। আগের পর্বের লিঙ্ক

এখানে, সবগুলো পর্বের লিঙ্ক একসাথে এখানে

কার্ল মার্ক্সের ধারণা ছিল পুঁজিবাদী সমাজগুলো অবধারিতভাবে এক পর্যায়ে সোশ্যালিস্ট/সমাজতান্ত্রিক সমাজে, আর তারপর একসময় কমিউনিস্ট সমাজে পরিণত হবে। মার্ক্সের ধারণা অনুযায়ী ইউরোপের অ্যাডভান্সড পুঁজিবাদী অর্থনীতিগুলো; বিশেষ করে ব্রিটেন, ছিল সোশ্যালিসম এবং কমিউনিসমের জন্য সবচেয়ে উর্বর ভূমি। মার্ক্স মনে করতো, খুব শীঘ্রই সর্বহারা তার দাসত্বের বাস্তবতা অনুধাবন করে বিদ্রোহে জেগে উঠবে। বুর্জোয়াদের পতন ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করবে মার্ক্সিস্ট কল্লরাজ্য।

কিন্তু গত শতাব্দীর শুরুর দিকে নিও-মার্ক্সিস্ট চিন্তাবিদরা একটা সমস্যার মুখোমুখি হল। তারা দেখতে পেল মার্ক্সের ভবিষ্যৎবাণী মিলছে না। ইউরোপের অ্যাডভান্সড সমাজগুলোতে সর্বহারাদের উপলব্ধি আসছে না। কাজক্ষিত বিপ্লব আসছে না।

হিসেব কেন মেলে না? কেন ইংল্যান্ড কিংবা জার্মানিতে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব আসছে না? কেন শ্রমিকরা এতো ভয়াবহ নির্যাতন ও শোষণের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহ করছে না?

যেসব নিও-মার্ক্সিস্ট চিন্তাবিদ এই প্রশ্নগুলোর জবাব খোজার চেষ্টা করেছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাতদের একজন হলেন ইটালির অ্যান্টোনিও গ্র্যামসি (Antonio Gramsci, মৃত্যু, ১৯৩৭ খ্রিঃ)। এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে গ্র্যামসি বললেন, জনগণের ওপর নিয়ন্ত্রন কেবল সংসদ কিংবা ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে আসে না। সত্যিকারের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রন প্রায় অবধারিতভাবে চালিত হয় সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রন দ্বারা।

কিভাবে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রন অর্জিত হয়? কিভাবে একটা সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণী বা গোষ্ঠী তাদের প্রভাব অর্জন করে? একবার প্রভাব ও ক্ষমতা অর্জনের পর কিভাবে তারা সেটা টিকিয়ে রাখে? প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলো এমন সামাজিক কাঠামো তৈরি করে যা জনমানুষের স্বার্থবিরোধী। তবু তাদের ক্ষমতা টিকে থাকে কিভাবে? কেন মানুষ তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না? কিভাবে সর্বহারা এতো সহজভাবে এমন একটা ব্যবস্থায় অংশ নেয় যেটা আসলে তাকে দাস বানিয়ে রেখেছে?

এই প্রশ্নগুলোর জবাবে গ্র্যামসির উত্তর হল – কালচার, সংস্কৃতি

গ্র্যামসি বললেন, ইউরোপের অ্যাডভান্সড পুঁজিবাদী সমাজে সর্বহারার বিপ্লব আসছে না, কারণ এ দেশগুলোর শক্তিশালী সংস্কৃতি আছে। সংস্কৃতির প্রচার করা এবং টিকিয়ে রাখার জন্য আছে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। এই সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো মিলেই বিদ্যমান ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখছে। সর্বহারাকে আটকে রাখছে বিপ্লবী হওয়া থেকে। এসব সমাজে বিপ্লব হচ্ছে না, কারণ এখানে একটা নির্দিষ্ট ধরনের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আধিপত্য আছে।

মানুষ কী চায়, মানুষের আকাঙ্ক্ষা কী, মানুষ স্বপ্ন কী-এগুলো ঠিক করে দেয় কালচার। পুঁজিবাদী সমাজের কালচার মানুষের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রন করে। সর্বহারাকে দাস বানিয়ে রাখে। সাংস্কৃতিক আধিপত্য বা কালচারাল হেজেমনি হল ঐ জিনিস যার মাধ্যমে কোন একটি শ্রেণী আধিপত্য অর্জন করে এবং নিজের বিশেষায়িত অবস্থান (privileged status) বজায় রাখে। গ্র্যামসির মতে, বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রনকে রক্ষা করে এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য।

আধুনিক বিশ্বে নিয়ন্ত্রন শুধু সামরিক না। বরং জনগণকে নিয়ন্ত্রনের অন্যতন প্রধান হাতিয়ার হল মিডিয়া। সমাজের সংস্কৃতির প্যারামিটার এবং সীমানাগুলো ঠিক করে দেয়ার মাধ্যমে মিডিয়া নিপুণভাবে জনগণের চিন্তা, চেতনা ও আবেগকে নিয়ন্ত্রন করে। নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে হিসেবে সামরিক শক্তির চেয়েও মিডিয়া বেশি কার্যকরী।

কিন্তু কালচার আসলে কী?

কিছু নিয়ম, রীতিনীতি, প্রথাপ্রচলন, কিছু ট্যাবু, কিছু মূল্যবোধ, কিছু মোটিফের সমষ্টিই তো, তাই না? তো এই রীতিনীতি, প্রথাপ্রচলন, ট্যাবু,মোটিফগুলো-এই কালচার-কে তৈরি করলো?

গ্র্যামশির মতে, কেউ যদি সমাজের ন্যারেটিভ নিয়ন্ত্রন করতে পারে, এবং কেউ যদি জনগণকে বোঝাতে পারে-

যেসব সাংস্কৃতিক রীতিনীতি (norms) আমাদের সমাজে আছে, সেটাই পৃথিবীর চিরন্তন রীতি, সবকিছু এভাবেই সবসময় ছিল অথবা এভাবেই সবসময় থাকার কথা-তাহলে মানুষ স্ট্যাটাস কৌ বা বিদ্যমান অবস্থা নিয়ে আপত্তি করবে না।

সাইক্লোনের কথা চিন্তা করুন। সাইক্লোন মানুষের জানমাল ধ্বংস করে। অনেক মানুষ আর কমিউনিটির জীবনে অবননীয় দুর্ভোগ নিয়ে আসে। ক্ষতি হয় লক্ষ লক্ষ কিংবা কোটি কোটি টাকার। কিন্তু মানুষ কখনো সাইক্লোনের ওপর রাগ করে না। কারণ সাইক্লোনের ধ্বংসযজ্ঞের পেছনে কোন বিদ্রোহ নেই। ক্ষতির কোন ইচ্ছা নেই। সাইক্লোনের জন্য কাউকে দায়ী করা যায় না, দোষী করা যায় না। এবং সাইক্লোনকে থামানো যায় না। এটাই জীবন। এটাই বাস্তবতা। একে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

কিন্তু সাইক্লোনের ক্ষেত্রে যেটা সত্য সমাজের প্রভাবশালী সংস্কৃতির জন্য তা সত্য না। সাইক্লোন এক অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা যা মানুষের নিয়ন্ত্রনের বাইরে। কিন্তু সংস্কৃতি মানুষ তৈরি করা। সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণী লোকেরা নিজেদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করা এবং টিকিয়ে রাখার জন্য সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রন করে। আর তাদের তৈরি করা এই সংস্কৃতির কল্যাণে সমাজের অন্য মানুষরা মনে করে-

সমাজের যুলুম, শোষণগুলো আসলে সাইক্লোনের মতোই জীবনের আরেকটা অমোঘ বাস্তবতা। এগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করা, এগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অর্থহীন। এগুলো মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

কিন্তু আসলে এটা বাস্তবতার চিরন্তন কোন অংশ না, অবধারিত, অমোঘ কিছু না। বরং এটা কালচারাল হেজেমনি বা সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মাধ্যমে তৈরি মায়া। বিভ্রম।

আর একারণেই মার্কেটের সেই বিপ্লব আসছে না। সর্বহারা এখনো শেকলে আটকে আছে, কারণ শেকল ভাঙ্গার বদলে তারা ঐ শেকলকে দুনিয়ার চিরন্তন বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিয়েছে। এটাই কালচারাল হেজেমনির শক্তি। কালচার একসময় মানুষের 'কমনসেন্স' হয়ে যায়। এবং এই 'কমন সেন্স' তখন সমাজের ওপর প্রভাবশালী শ্রেণীর নিয়ন্ত্রন আর আধিপত্যকে বৈধতা দেয়। জনগণকে বলে-

অর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অনেক কিছু হয়তো তোমার ভালো লাগছে না। কিন্তু এটাই বাস্তবতা, এটা মেনে নিতে হবে...

আর এভাবে সর্বহারা অমোঘ মনে করে ঐ কাঠামোর ভেতরে, ঐ কাঠামোর নিয়ম মেনে অংশ নেয়। আর আধিপত্যের কাঠামোর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সর্বহারা বিদ্যমান বাস্তবতা ও ব্যবস্থাকে বৈধতা দিয়ে দেয়। শক্তিশালী করে।

সামরিক আধিপত্যের মতোই সাংস্কৃতিক আধিপত্যের উদ্দেশ্য ক্ষমতায় টিকে থাকা। আর ক্ষমতায় টিকে থাকার সবচেয়ে

কার্যকরী উপায় হল, মানুষের মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করা। এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বুদ্ধিজীবীরা। তাদের কথা, আলোচনা, ইত্যাদি মানুষের মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে। তাদের লেখাগুলোই পত্রিকায় ছাপা হয়। তারাই টকশোতে গিয়ে নানা ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ আওড়ায়। এদের গবেষণাগুলোই জার্নালে প্রকাশিত হয়, এরাই পাঠ্যবই লিখে, পাঠ্যসূচী ঠিক করে। পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তার ছক ঠিক করে দেয় এরাই। আর এরা এই অবস্থান আসার সুযোগ পায়-এদেরকে এই অবস্থানে আসতে এবং থাকতে দেয়া হয়-কারণ তারা বিদ্যমানতাকে বৈধতা দেয়।

এই কালচারাল হেজেমনি যে সবসময় কোন সংগঠিত গোষ্ঠীর মাধ্যমে তৈরি হয়, তা না। অনেক সময় কেবল ব্যক্তিস্বার্থ থেকে মানুষ বিদ্যমান ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে। বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরোধিতা করতে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হবার ব্যাপক আশঙ্কা থাকে। সেই ঝুঁকি না নিয়ে ব্যক্তিস্বার্থের জায়গা থেকে অনেক মানুষ চিন্তা করে, কীভাবে বর্তমান ব্যবস্থা থেকে সে লাভবান হতে পারে। আর এভাবে সে বিরাজমান সিস্টেমের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়, এবং সিস্টেমকে সমর্থন করে। এবং অধিকাংশ মধ্যবিত্তকে এভাবেই চিন্তা করতে শেখানো হয়।

গ্রামশির কালচারাল হেজেমনি তত্ত্বের আলোচনা ব্যাপক। এটা খুব সরলীকৃত উপস্থাপন। এই তত্ত্বের অনেক দিকের সাথে আমরা একমত না। এর বিস্তারিত খুঁটিনাটি, অ্যাকাডেমিক বিশ্লেষণ আমাদের জন্য জরুরীও না। তবে সমাজ ও রাষ্ট্রে ক্ষমতার কাঠামোকে বোঝার ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব আমাদের কাজে লাগতে পারে।

যেমন, এই পুরো আলোচনা থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটি উপসংহার খুঁজে পেতে পারি-

বাংলাদেশে মুসলিমদের সামনে অন্যতম প্রধান সমস্যা হল সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠীর কালচারাল হেজেমনি বা সাংস্কৃতিক আধিপত্য। আর বাংলাদেশে তাদের এই আধিপত্যের মূল স্তম্ভগুলো হল হল- শিক্ষা, মিডিয়া, আইন এবং 'অনুমোদিত ইসলাম' (অর্থাৎ সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠী যতোটুকুইসলামকে বৈধতা দেয় ততোটুকু পালন)।

শহরে এলিটদের চেয়ে মাদ্রাসার "হুজুররা" কিংবা সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণের পরও দ্বীন পালন সচেষ্টি 'প্র্যাকটিসিং মুসলিমরা' অনেক দিক অধিক জনসম্পৃক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও হলেও তাদের জীবন, তাদের ওপর যুলুম হত্যা গুরুত্ব পায় না। এর কারন হল সেক্যুলার-প্রগতিশীলদের এই সামাজিক আধিপত্য।

শিবির আর কোটা আন্দোলন, দুটোর ওপরই হামলা হয়, কিন্তু 'সমাজের' প্রতিক্রিয়া হয় ভিন্ন। 'তাগুব' আর 'ক্র্যাকডাউন' -এর ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া হয় ভিন্ন। টিপ আর হিজাবের "অধিকার", দুটো নিয়েই তর্কহয়। কিন্তু প্রতিক্রিয়া হয় ভিন্ন।

দুই ক্ষেত্রে দুই বয়ান। দুই নিয়ম।

কাজেই বাংলার মুসলিমদের বর্তমান দুর্বল, অসহায় ও আক্রান্ত অবস্থাকে বদলাতে হলে সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সামাজিক আধিপত্যকে আগে ভাঙতে হবে। আর তার প্রথম ধাপ হল তাদের তৈরি করা বাঙ্গালিহু, বাঙ্গালিয়ানা এবং বাঙ্গালি সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বয়ান পুরোপুরিভাবে বর্জন করা।

পরের পর্বের লিঙ্ক